বাঙালির সর্বজনীন উৎসবের রূপান্তর

শা ম সু জ্জা মা ন খা ন

বাঙালি জাতির ইতিহাসের মতো বাংলা সনের ইতিবৃত্তান্তও নানা তথ্যশূন্যতায় ভরা। বিগত দেড় যুগেরও অধিককাল ধরে নিরলস চেষ্টায় এর প্রামাণিক ও পর্যায়ক্রমিক ইতিহাসের হদিস আমরা পাইনি। প্রাচীন বঙ্গেয় গৌড় অঞ্চলের রাজা শশাঙ্ক (৫৯৩-৬৩০), মধ্যযুগের বংলার সুলতান হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯) ও মহামতি আকবরের (১৫৫৬) মধ্যে কে বাংলা সনের প্রকৃত প্রবর্তক তা নিয়ে বিতর্ক এখনো শেষ হয়নি। তবে আধুনিক ঐতিহাসিক ও পণ্ডিতদের মতে, আকবরের দিকেই যে পাল্লাটা ঝুঁকে আছে সে কথা আমরা আগে পত্রিকান্তরে বলেছি। এবারের এই রচনায়ও বলতে প্রয়াসী হব। গোটা বিশ্বের সাল-তারিখের অনুরাগী ও নিষ্ঠাবান গবেষক শ্রী পলাশবরণ পাল নানামুনির নানা মত পরীক্ষা করে সম্রাট আকবরের দিকে দ্বিধাহীনভাবে অঙ্গুলি নির্দেশ না-করলেও যে পর্যাবেক্ষণ রেখেছেন তা 'আকবর থিয়োরি'-কে জোরদার করে। তিনি লিখেছেন 'কেউ যুক্তি দিতে পারেন শশাঙ্ক যেহেতু বাংলারই রাজা ছিলেন তাই তার আমলে একটা অব্দ চালু হলে সেটার 'বঙ্গাব্দ' নাম হওয়া অসম্ভ নয়, কিন্তু আকবরের প্রতিষ্ঠিত অব্দের নাম 'বঙ্গাব্দ' হবে কেমন করে? এ যুক্তি ধোপে টেকে না, কেননা বঙ্গাব্দ কথাটার ব্যবহার খুব আধুনিক। গত কুড়ি-পঁচিশ বছর আগে বঙ্গাব্দ কথাটার চল ছিল না, তখন বলা হত শুধুই 'সাল' বা 'সন' । পশ্চিম ভারতে কেউ বিক্রম সংবৎকে বিক্রম সাল বা বিক্রম সন বলে না। নেপালে বুদ্ধ সংবৎকে কেউ বুদ্ধ সাল বলে না। বাংলায় তা হলে 'সাল' বা 'সন' বলা হয় কেন? এইখানে মনে রাখতে হবে সাল কথাটা ফার্সি, সন কথাটা আরবি। এ থেকে মনে হয়, হিজরি ক্যালেন্ডার থেকেই কোনোভাবে উদ্ভূত আমাদের বাংলাা অব্দ বা বাংলা সাল। তা যদি হয় তাহলে 'আকবর থিয়োরির' চেয়ে বিশ্বাস্য অন্য কোনো থিয়োরির সন্ধান পাওয়া মুশকিল।' (সমতট প্রকাশনী, কলকাতা ১৯৯৪) শ্রী পালের এ উক্তি খুবই যথার্থ।

বাংলা সনের ইতিহাস নিয়ে নিস্পৃহভাবে ঘাঁটাঘাঁটি করে তা মুলসলমান রাজা-বাদশাহদের দ্বারা প্রবর্তিত বলেই প্রতীয়মান হয়। কারণ, রাজা শশাঙ্ক যখন রাজত্ব করেছেন (৫৯৩-৬৩০) তখন 'বঙ্গ' বা 'বাংলা' দেশ-নাম বা ভাবনা হিসেবে বিকশিত হয়নি। তখন গৌড়েরই প্রাধান্য। শশাঙ্ককে বলা হত গৌড়াধিপতি বা গৌড়েশ্বর। অতএব, বঙ্গ বা বাংলা নামাঙ্কিত কোনো অব্দ তার দ্বারা প্রবর্তন করা সম্ভব বলে আমরা বিবেচনা করি না। তাছাড়া, বাংলা অব্দকে বাংলা সন বলা হয়েছে, বঙ্গাব্দ বলা হয়নি। আরবি শব্দ 'সন' বঙ্গাব্দের সঙ্গে যুক্ত থাকায় মনে করা স্বাভাবিক হয় কোনো-না-কোনোভাবে এটা মুসলমান সুলতান বা সম্রাটদের রাজত্বকালে বা তাঁদের প্রভাবে প্রবর্তিত। এই প্রেক্ষাপটে দেখা হলে সুলতান হোসেন শাহ, বাংলা সনের প্রবর্তক এ বিষয়টিকেও

খারিজ করা যায় না। কারণ, মধ্যযুগের মুসলিম সুলতানি আমলেই দেশ-নাম ও জাতীয়তার ক্ষেত্রে 'বঙ্গ' 'বাঙ্গালা' বা 'বাঙালিত্ব' একটা সুস্পষ্ট ও দিক-নির্দেশক ভাবনা হিসেবে গড়ে উঠতে শুরু করে। তাঁদের মধ্যে শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ, নিজেকে শাহ-এ-বাঙ্গালিয়ান বলে পরিচয় দিতে ভালোবাসতেন। ফার্সি ভাষায় লিখিত বই পুঁথিতে এদেরকে 'শাহ-ই-বাঙ্গালাহ' বা 'সুলতান-ই-বাঙ্গালিয়ান' বলে অভিহিত করা হয়েছে। অতএব, শশাঙ্কের 'গৌড়ের' বিপরীতে বঙ্গ, বঙ্গালহ, বাঙ্গালা, বাংলার স্বাধীন সুলতানি আমলের অনন্যকীর্তি। সে হিসেবে 'বাংলা সন' তাঁদের দ্বারা প্রবর্তিত হওয়া খুবই সম্ভব। তবে, মধ্যযুগ বিশেষজ্ঞ শ্রী যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য হোসেন শাহকে বাংলা সনের প্রবর্তক মনে করলেও এ ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য তথ্য দেননি। তাই যুক্তিবিচারে তা গ্রাহ্য হয়নি। অন্যদিকে বিশ্বখ্যাত বাঙালি নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের বক্তব্য বাংলা সনের আলোচনায় এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। ১৯৯৮-এর আগস্ট মাসে দিল্লিতে প্রদত্ত শতাব্দী মূল্যায়ন বক্তৃতায় ড. সেন সম্রাট আকবরকে বাংলা সনের প্রবর্তক বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, ১ হাজার হিজরি সালকে সামনে রেখে সম্রাট আকবরের ভারতীয় সন সংস্কারের যে পরিকল্পনা করেন তারই ফল হল হিজরির সঙ্গে সমন্বিত বাংলা সন যা তিনি ৯৯৩ হিজরিতে সংস্কার করে ৯৬৩ হিজরিতে তার রাজ্যাভিষেকের বছর (১৫৫৬) থেকে সৌর সন হিসেবে চালু করেন। হিজরির চান্দ্র সন। যাই হোক, বাংলা সনের কিছু কিছু ব্যবহারের উদাহরণ বাংলা প্রাচীন পুঁথি ও শিলালিপিতে আছে। সাম্প্রতিক কালে ড. শ্যামলকুমার চক্রবর্তী কর্তৃক আবিষ্কৃত 'ঝথমদথষথ ঝয়সষপ ওষঢ়ধড়মহয়মসষ সফ ঝথরপ ণপথড় ১৬৭৭ ড়পধসড়নমষব হলৎষনপড় সফ ঈথলধৎয়য়থ দী ঝমড়থয-ৎন-উথৎলথ.' এতে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা কর্তৃক বাংলা ১১৬২ সনে (১৭৫৬ খ্রি.) কলকাতায় লুটপাটের বিষয়টি উল্লিখিত হয়েছে। শিলালিপিতে ১১৬২ সনের উল্লেখে বোঝা যায়, ওই সময়ে বাংলা সন রাজকর্তৃপক্ষের রেকর্ডপত্রে ব্যবহার হয়েছিল।

দুই.

বাংলা সন বিগত কয়েক শত বছর ধরে গ্রামবাংলায় ব্যাপকভাবে চালু ছিল এবং এখনো আছে। গ্রামবাংলায় ঘর গেরস্থালির কাজ ছাড়াও রাজস্ব ও খাজনা লেনদেন বাংলা সন দ্বারাই হয়ে থাকে। অতএব, এই সন যে কৃষি ও খাজনা আদায়ের সঙ্গে সম্পর্কিত সে সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। গ্রামবাংলার মানুষ বাংলা সন অনুযায়ীই খাজনাপাতি পরিশোধ করেছে। এজন্যই এই সনকে ফসলি সন বলা হয়েছে বলে মনে করা হয়। কৃষিজীবী সমাজের উৎসবের সঙ্গেও বাংলা সনের সম্পর্ক রয়েছে। 'আমানি' উৎসবটির কথা এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে। গ্রামীণ বাংলাদেশে বাংলা সন ও তার সংস্কৃতি ব্যাপকভাবে চালু থাকলেও তার মধ্যে কিছু আঞ্চলিক প্রভেদ ও ভিন্নতা লক্ষণীয়। কোথাও পারিবারিক আমানি উৎসব, কোথাও গরুর দৌড়, ষাঁড়ের লড়াই, কোথাও বা মোরগ লড়াই, নানা ধরনের মেলা, পুতুল নাচ, গ্রামীণ খেলাধুলা ইত্যাদি। দেশব্যাপী সর্বজনীন উৎসবে এসব উপাদান পাওয়া যায় না। তবে হালখাতা উৎসবটি কিন্তু বেশ ব্যাপকতা

লাভ করে ছিল এবং শহর-গ্রামে ব্যাপক ও প্রাথমিকভাবে উদযাপিত হতে থাকে। বিগত পঞ্চাশ-ষাট বছরে বাংলা নববর্ষ উৎসবের রূপান্তর প্রক্রিয়াটি বুঝতে গেলে আমাদের তথ্যগত ও পর্যায়ক্রমিকভাবে এগুতে হবে। আমরা সে চেষ্টাই কিছুটা করব বর্তমান নিবন্ধে। তথ্য ফারাক সত্ত্বেও এ পথেই এগোতে হবে। আমরা তাই পাকিস্তান আমলে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উপাদান হিসেবে বাংলা নববর্ষ উদযাপনের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার লক্ষ করি।

১৯৭৪ সাল থেকে পাকিস্তানি শাসন আমলে যে ঔপনিবেশিক, স্বৈরতান্ত্রিক ও ধর্মসাম্প্রদায়িক শাসনপদ্ধতি চালু হয় তার প্রতিক্রিয়ায় পূর্ব বাংলায় বাঙালি জাতীয়তাবাদী তৎপরতা জোরদার হয়ে ওঠে। বাংলা নববর্ষ ও তার আনুষাঙ্গিক নানা আঞ্চলিক উৎসব অনুষ্ঠানকে নতুনভাবে বিন্যস্ত করার প্রয়াস চলে নগরবাসী-শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে। এ বিষয়ে ১৯৫৪ সালে কিছু তথ্য পাই সরলানন্দ সেনের, 'ঢাকার চিঠি' বইয়ে। এই চিঠি তখনকার কলকাতার 'যুগান্তর' পত্রিকায় ছাপা হত। ১১ এপ্রিল ডেটলাইনে ঢাকা থেকে ওই পত্রে বলা হয় ঃ 'পয়লা বৈশাখ হিন্দু-মুসলমান প্রত্যেক বাঙালির প্রিয় নববর্ষ দিবস। যেদিন থেকে বাঙালি সংস্কৃতির সেবায় হিন্দু-মুসলামান দুই ভাই একে অপরের হাত ধরে আত্মনিয়োগ করেছে, সেদিন থেকে বাঙালির পয়লা বৈশাখ বাঙালির প্রিয় উৎসব দিবস।' পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মুসলিম লীগের দুঃশাসন বাঙালিয়ানার শ্বাসরোধ করে রেখেছিল। পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের সভাপতি ড. কাজী মোতাহার হোসেন তাই পহেলা বৈশাখ সরকারি ছুটির দিন বলে ঘোষণা করতে অনুরোধ জানিয়ে তখন এক বিবৃতি দিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, 'আগামী ১৪ এপ্রিল বাংলার নববর্ষ শুরু হবে। এই নববর্ষ দিবস সব বাঙালিরই এক বিশেষ উৎসবের দিন। পূর্ব বাংলার সর্বত্র জনসাধারণ আনন্দ ও উৎসবের মধ্যে এই দিবসটি পালন করবে, সুখ ও সমৃদ্ধিপূর্ণ নতুন বছরের সংকল্প ও পরিকল্পনা গ্রহণ করবে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন মহল থেকে নববর্ষ উপলক্ষে ছুটি ঘোষণা করার দাবি উঠেছে।' এ দাবি পরে গৃহীতও হয়েছে।

১৯৫৪ সালে ঢাকায় নববর্ষ উদযাপনের তথ্যও পাচ্ছি সরলানন্দ সেনের ওই বইয়ে। এতে বলা হয়েছে ঃ 'ঢাকা ১৮ এপ্রিল; এ বছরে ঢাকা শহরে নববর্ষ দিবস উপলক্ষে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে প্রতিটি নর-নারীর, মনে যে উদ্দীপনা দেখা যায়, বঙ্গ বিভাগের পর কখনো এমনটি আর দেখা যায়নি। পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ নববর্ষোৎসব উপলক্ষে স্থানীয় মাহবুব (আলী) ইনস্টিটিউটে একটি গীতিবিচিত্রা ও শকুন্তলা নৃত্যনাট্যের অনুষ্ঠান করে। এছাড়া পূর্ববঙ্গ লেখক সংঘ, আজিমপুরা এস্টেট ছাত্র সংঘ, আমাদের বৈঠক ও পূর্ব-পাকিস্তান যুবলীগও নববর্ষোৎসব পালন করে।

তৎকালীন পূর্ববঙ্গে জেলা সদর শহরগুলোতেও প্রচুর আড়ম্বরসহকারে নববর্ষোৎসব পালিত হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী এ কে ফজলুল হক তাঁর বাণীতে বলেন, 'আজ বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন। এই উপলক্ষে আমি আমার একান্ত প্রিয় পূর্ববঙ্গবাসীকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন।'

পূর্ব বাংলায় বাংলা নববর্ষ উৎসব উদযাপন এই বর্ণনা থেকে আমরা বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে এর সম্পর্ক-প্রক্রিয়ার বিষয়টি প্রত্যক্ষ করি। পরে তা আরো জোরালো হয়ে সাংস্কৃতিক স্বাধিকার সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি হওয়ায় এ ধারা স্তিমিত হয়ে প্রকাশের জন্য সুযোগ খুঁজতে থাকে।

১৯৬১ সালে পূর্ব বাংলায় রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী পরবর্তী সময়ে ছায়ানট (১৯৬১) বাঙালি সংস্কৃতির উজ্জীবন ও প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে শুরু করে। প্রধানত রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হলেও বাঙালির সামগ্রিক সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রেই একটি প্রগতিশীল ধারা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করে। বিশেষ করে রমনার বটমূলে প্রতিবছর সকালে বাংলা নববর্ষের বিশাল উৎসবের আয়োজন ছায়ানটের অনন্যকীর্তি। এ শুধু পাকিস্তানি শাসক-শোষকদের পশ্চাৎপদ ও জাতীয় সাংস্কৃতিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে উত্থানই নয়, একইসঙ্গে বাঙালির শত শত বছরের আঞ্চলিক ও বিচ্ছিন্ন বৈশাখি উপাদানকে সমন্বিত করে এক নবরূপ দান। বৈশাখের উৎসবকে ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় উৎসবে পরিপূর্ণতা দান। সেই থেকে নববর্ষের উৎসব আমাদের মূল সংস্কৃতির অন্তর্গত হয়ে বহুমাত্রিক তাৎপর্য লাভ করেছে। এরশাদের স্বৈরশাসনামলে ঢাকার চারুকলা ইনস্টিটিউটের ছাত্ররা বাংলা নববর্ষের উৎসব উপলক্ষে যে আনন্দ-মিছিলের আয়োজন করতে শুরু করে তা এক প্রতীকী তাৎপর্য অর্জন করেছে। নানা প্রাণীর অবয়ব ও মুখোশ বকধার্মিক ও ঐতিহ্য বিরোধীদের নানাভাবে আঘাত করেছে এবং এর মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের শিকড় স্পর্শ করে নতুন বাঙালি চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছি। এ হল ঐতিহ্যের স্বর্ণসূত্রে হাত রাখা। এই ঐতিহ্যানুসন্ধান আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের নবনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

উৎসঃ ভোরের কাগজ